ভারতভাগ কি অনিবার্য ছিল ?

আকবর আহমেদ তাঁর *Jinnah, Pakistan and Islamic Identity* (1997) শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন যে, মুসলমানদের হৃদয়-মনে পাকিস্তানের ধারণাটি গভীরভাবে জুড়ে বসেছিল। তাই দেশভাগের সিদ্ধান্ত মুসলিমদের বিচারে ছিল যুদ্ধজয়ের সমান এবং স্বতন্ত্র জাতিসত্তার স্বীকৃতি। এই পরিণতির প্রধান রূপকার ছিলেন জিন্না এবং মুসলিম লীগ। উমা কাউরা (U. Kaura) তাঁর *Muslims and Indian Nationalism* (1977), স্টানলী ওলপার্ট (S. Wolpert) তাঁর *Jinnah and Pakistan* (1984), অনিতা ইন্দর সিং (A. I. Singh) তাঁর *The Origins of the Partition of India* (1987) প্রভৃতি গ্রন্থে দেশভাগের অনিবার্যতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। এঁরা মোটামুটি ভাবে সহমত পোষণ করেন যে, জাতীয় কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে ধর্ম-নিরপেক্ষ ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের পক্ষপাতী ছিল। গান্ধী, আজাদ, প্যাটেল, নেহরু প্রমুখ সাম্প্রদায়িক নিরোধ বা দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের বিরোধী ছিলেন। অন্যদিকে জিন্না ১৯৩৭-এর পরবর্তীকালে মুড়ভাবে দ্বি-জাতি তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরেন এবং মুসলিম লীগ-এর সাংগঠনিক শক্তিকে ব্যবহার করে সমস্ত রকম আপস মীমাংসার পথ বন্ধ করে দেন।

ভারত বিভাগের পশ্চাৎপটে মহম্মদ আলি জিন্না ও মুসলিম লীগের ভূমিকা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'পার্টিশনের পক্ষে দীগ' ইতিহাসের এহেন ব্যাখ্যা সংশোধনবাদী ঐতিহাসিকরা খণ্ডন করেছেন। ড. অমীম রায় তাঁর *'The high politics of India's partition : The revisionist perspective* (1993) শীর্ষক প্রবন্ধে প্রচলিত এই ধারণাকে 'কল্পকাহিনী' বলে মন্তব্য করেছেন। জিন্না ১৯৩৭-এর পরবর্তীকালে 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' উপর জোর দিয়েছিলেন, এ-কথা ঠিক। কিন্তু তিনি রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিকল্পিত ভাবেই ভারত বিভাগের ছক কষেছিলেন, এমন ধারণা ইতিহাসসম্মত নয়। বস্তুত তাঁর রাজনৈতিক জীবন এবং ভারতীয় রাজনীতির মূল স্রোতের ক্রমপরিবর্তনের পরিনামেই ভারত বিভাগের ঘটনা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

ভারত বিভাগে জিন্নার দায়িত্ব নিরূপনের ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের চানাপোড়েন ও ক্রমপরিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিস্টার হয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে জিন্না তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ধর্ম-নিরপেক্ষ, উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী হিসেবে তিনি নিজেকে তুলে ধরেন। মুসলিম লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী তত্ত্ব তাঁর মনঃপুত ছিল না। বরং তিনি লীগের জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের তত্ত্বকে আক্রমণ করতেন। লীগের সভাপতি আগা খাঁ পরবর্তীকালে বলেছিলেন যে, ১৯০৬-এ জিন্না ছিলেন আমাদের সবচেয়ে শক্ত প্রতিপক্ষ। উলপার্ট *'জিন্না অব পাকিস্তান'* গ্রন্থে বলেছেন যে, লীগের স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলীর দাবীকে জিন্না জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী বলেই মনে করতেন। স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধিতা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, এই ব্যবস্থা ভারতকে এমন 'দুটি পৃথক কামরায় ভাগ করে দেবে যে একটা থেকে আরেকটায় আর পর্যন্ত পড়াবে না'। *বিপানচন্দ্রের* মতে, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জিন্না মুসলিম লীগে যোগ দেওয়ার পর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর রূপান্তর শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে তিনি তখনও কংগ্রেসের প্রতি আস্থাশীল ও জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। একই সঙ্গে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসও চালিয়ে যান। জিন্নার এই দ্বৈত-ভূমিকার নিদর্শ প্রকাশ দেখা যায় কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬ খ্রীঃ) স্বাক্ষরের ঘটনায়। ওলপার্ট-এর মতে, মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী এবং আসন সংরক্ষণের দাবীতে স্থির থাকলেও, এই পর্যায়েও জিন্না জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। রাওলাট বিলের প্রতিবাদে অহিংসসভা থেকে পদত্যাগ এবং ভারতের স্ব-শাসনের দাবী যুক্তিযুক্ত এই মনোভাব প্রকাশ করে জিন্না তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার দেন। *অধ্যাপক বিপানচন্দ্রের* মতে, গান্ধীজি অসহযোগ আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিলে জিন্না ক্ষুব্ধ হন। কংগ্রেসের গণ আন্দোলনের সম্ভাবনা ও সাফল্য তাঁর রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের পক্ষে প্রতিকূল হবে বলে জিন্না মনে করতেন। এমতাবস্থায় তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ভর করে নিজের নেতৃত্বকারী ভাবমূর্তি বজায় রাখতে উদ্যোগী হন। *বিপানচন্দ্র* লিখেছেন, এইভাবে জিন্না প্রথমে জাতীয়তাবাদী থেকে *'সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীতে'* ও তারপর *'উদারনৈতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীতে'* রূপান্তরিত হন।

১৯২০-র দশকে মুসলিম লীগকে কেন্দ্র করে জিন্নার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এগোতে থাকে। মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার সংগঠন হিসেবে তিনি লীগকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন। তবে এই পর্যায়েও তাঁর জাতীয়তাবোধ সম্পূর্ণ রূপে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবোধে দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না। এই সময়েও তিনি লক্ষ্ণৌ চুক্তির ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও যৌথ কর্মসূচীর পক্ষে স্থির ছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক মুসলমান যুবক নিজেকে *'প্রথমে একজন মুসলমান, পরে একজন ভারতীয়'* এই কথা বললে জিন্না বলেছিলেন, *"না না, তুমি প্রথমে ভারতীয়, তারপরে মুসলমান"*।

Scanned with CamScanner

২০-এর দশকের শেষ দিকে জিন্নার রাজনৈতিক জীবনে আবার একটা সংকট ও দোদুল্যমানতা দেখা যায়। তিনি নেহরু রিপোর্টের বিরোধিতা করেন। ফলে জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা মহম্মদ আনসারি, টি.এ.কে. শেরওয়ানী, সৈয়দ মামুদের সাথে তাঁর মতান্তর প্রকট হয়। এমতাবস্থায় নিঃসঙ্গ জিন্না প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম নেতা আগা খাঁ, মহম্মদ শফি প্রমুখের দিকে সরে যেতে বাধ্য হন। এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তিনি সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শবাদ ভিত্তিক 'চৌদ্দ দফা দাবী' (১৯২৯ খ্রীঃ) পেশ করেন। অধ্যাপক বিপানচন্দ্র এটিকে জিন্নার 'পতনের প্রতীক' বলে উল্লেখ করেছেন। এই সংকট ঘনীভূত হয় ৩০-এর দশকে। কংগ্রেস ব্যাপক গণ-আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত করলে জিন্না গান্ধীর রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির সম্ভাবনায় শঙ্কিত হন এবং জাতীয় রাজনীতির মূল স্রোত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন। অন্যদিকে মুসলমান যুব সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদ ও বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হলে জিন্নাকে শূন্যতা গ্রাস করে। জিন্না রাজনৈতিক হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে লন্ডনে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন।

সক্রিয় রাজনীতির আকর্ষণ তাঁকে আবার দেশে টেনে আনে। ১৯৩৬-এ তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পুনরায় মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন। এই সময়ের জিন্না সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবোধে আচ্ছন্ন হননি কিংবা স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের কথা তাঁর ভাবনায় স্থান পায়নি। উদারনৈতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদের ভিত্তিতে তিনি মুসলিম লীগকে পুনর্গঠিত করেন। ১৯৩৬-এর মার্চে লাহোরে জিন্না বলেছিলেন, "*কোন কোন ক্ষেত্রে আমি হয়তো ভুল করেছি। কিন্তু কখনো কোন গোষ্ঠীর পক্ষ নিয়ে তা করিনি। দেশের কল্যাণই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য।*" তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, "*ভারতের স্বার্থই আমার কাছে সর্বাধিক পবিত্র, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। কোন কিছুই এই সিদ্ধান্ত থেকে আমাকে এতটুকু সরাতে পারবে না।*" অধ্যাপক বিপানচন্দ্র মনে করেন জিন্না ১৯৩৭-এর নির্বাচনে 'আধা-জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী ধরনের কর্মসূচী' নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে লীগের ভরাডুবির পর জিন্না উপলব্ধি করেন যে আধা-জাতীয়তাবাদী আধা-সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ভিত্তি করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না। অতঃপর তিনি কট্টর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে এগিয়ে যান। তাঁর বিভিন্ন ভাষণে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য চেতনা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির আদর্শ প্রকাশ পায়। ১৯৪১-এর মার্চ মাসে আলিগড়ে তিনি বলেছিলেন, "*এই দেশে আপনারা যদি ইসলামকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে চান তাহলে 'পাকিস্তান'কে বাস্তবায়িত করা কেবল একটা লক্ষ্যই নয়, একমাত্র লক্ষ্য।*" এক মাসের মধ্যেই লীগের সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, ঐক্যবদ্ধ ভারতে '*মুসলমানরা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে*'।

আয়েশা জালাল (Ayesha Jalal) তাঁর *The Sole Spokesman : Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan* শীর্ষক গ্রন্থে (১৯৮৫) সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জালালের মতে, ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জিন্না বা লীগ পৃথক পাকিস্তানের দাবী স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেননি। তাঁর মতে, লাহোর প্রস্তাবে (১৯৪০ খ্রীঃ) দেশ বিভাগ বা পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন সংক্রান্ত কোন বিষয় ছিল না। লাহোর প্রস্তাব ছিল জিন্নার এক কৌশলী চাপসৃষ্টিকারী চাল। কংগ্রেস চেয়েছিল ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী কেন্দ্র। কিন্তু জিন্না প্রস্তাব করেন দুর্বল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর যেখানে কেন্দ্রে থাকবে হিন্দু-মুসলিম সমান প্রতিনিধিত্ব এবং প্রদেশগুলির থাকবে প্রবল স্বাতন্ত্র্য। জিন্নার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বিভাজন এড়ানোর জন্য কংগ্রেস এই দাবী মেনে নেবে। জালালের মতে, জিন্নার এই ধারণাটাই ছিল মহাভুল ও বিপর্যয়ের কারণ। কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত দেশ বিভাগের মধ্যেই সমাধান খুঁজে নেয়। এ-কারণে গবেষক অসীম রায় বলেছেন, "*দিনের শেষে লীগ নয়, কংগ্রেসই ভারত মাতার দেহে ছুরিকাঘাত করেছিল।*" আয়েশা জালাল মনে করেন পাকিস্তান দাবীর এই অস্পষ্টতাই মুসলমান জনসমাবেশের ঐক্যবদ্ধতা এবং মুসলিম জাতীয় সত্তা গঠনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের সাফল্য 'পাকিস্তান'-এর দাবীকে মুসলিম জনসংগঠনের ভাবাদর্শগত প্রতীকে পরিণত করে। ফলে অভ্যন্তরীণ বৈষম্য ও বৈচিত্র্য ভুলে মুসলিম সমাজ স্বতন্ত্র জাতিরাষ্ট্র গঠনের দাবীতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে, জালাল তাঁর *Self and Sovereignty* (2000) শীর্ষক গ্রন্থে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত কিছুটা সংশোধন করেছেন। অবশ্য সেখানেও তাঁর মূল্যায়নের যথার্থতা সম্পর্কে সংশয় আছে যা মুশিরুল হাসানের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। হাসান তাঁর *India's Partition : Process, Strategy and Mobilization* (1993) গ্রন্থে বলেছেন যে, 'দ্বিজাতি' তত্ত্বের ধারণাটি সমগ্র মুসলিম সমাজের ঐক্যমতের ওপর দাঁড়িয়েছিল, এমন ধারণা সঠিক নয়। রাজনৈতিক নীতি গ্রহণ ও রূপায়নের প্রশ্নে জাতীয় কংগ্রেসের মতোই মুসলিম লীগে উপদলীয় কোন্দল ছিল। নিচু থেকে উঁচু পর্যন্ত নানা স্তরেই মুসলমানদের একাংশ পৃথক জাতি রাষ্ট্র গঠনের বিপক্ষে ছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত এঁদের অনেকেই উপর থেকে চাপানো সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই জিন্নার নেতৃত্বকারী ভূমিকার দায় অস্বীকার করা চলে না। জিন্না বিভাজন চাননি, কিন্তু বিভাজনের উপাদানগুলি লীগের মধ্যে সক্রিয় হলে তাদের নিরস্ত করার কোনও উদ্যোগ তিনি নেননি। অনেকেই মনে করেন, কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠের দল হিসেবে তার কর্তব্য যথাযথ পালন করতে পারেনি। ড. অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, "*কংগ্রেস প্রায় সমস্ত স্বার্থ ও মতকে আপন জাতীয়তাবাদী ছত্রতলে আনতে সক্ষম হলেও মুসলিমদের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছিল এবং হয়েছিল বলেই দেশভাগ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।*" গান্ধীজির একান্ত সচিব ও জীবনীকার প্যারেলাল মনে করেন, সেই মুহূর্তে কংগ্রেসের অধিকাংশ প্রথম সারির নেতা প্রায় প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যে পৌঁছেছিলেন। জীবনসায়াহ্নে এসে তাঁরা আর স্বাধীনতার জন্য দর-কষাকষির মতো মনের জোর পাননি। তাঁদের যৌবনে এমন প্রস্তাব এলে সম্ভবত তা প্রত্যাখ্যান করা হত।

অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় 'ওয়ার্ড পার্টিশন ইনএভিটেবল' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন যে, কংগ্রেসের যে-কোন মূল্যে স্বাধীনতার উদগ্র বাসনার ফলেই দেশ ভাগ অনিবার্য হয়েছিল (*Partition turned unavoidable on account mainly of the Congress leadership's adherence to compromise with Britain at any price.*)। মার্কসবাদী লেখক বিপানচন্দ্র মনে করেন যে, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশ ভাগ আটকানোর মতো কোন চটজলদি সমাধান কংগ্রেসের কাছেও ছিল না। তবে ১৯৩৭-এর সূচনা থেকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঢেউ প্রতিহত করে মুসলিম জনগণকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতে যুক্ত করতে জাতীয় কংগ্রেস ব্যর্থ ছিল। সেই ব্যর্থতার অনিবার্য পরিণতি ছিল ভারত-বিভাগ। আর এক বামপন্থী ঐতিহাসিক সুমিত সরকার *A critique of Colonial India (1985)* গ্রন্থে বলেছেন যে, ৩০-এর দশকে সাম্প্রদায়িকতা সর্বব্যাপী ছিল না। কৃষক ও শ্রমিকদের গণ আন্দোলনগুলিতে যথেষ্ট সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-সক্রিয় ছিল। কংগ্রেস আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের বৃথা প্রয়াস নেয় এবং দেশ ভাগকেই সমস্যা সমাধানের পথ হিসেবে বরণ করে। অথচ আরও বেশী আকারে গণআন্দোলন সংগঠিত করলে হয়তো দেশভাগ এড়ানো যেত। ভারত বিভাগের জন্য অনেকেই নেহরু ও প্যাটেলকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণা নেহরু, প্যাটেল প্রমুখের পদলাভের ব্যাকুলতা এই ধরনের একটা অসাম্প্রদায়িক ধারণাকে শক্তিশালী হতে সাহায্য করেছে। গান্ধীজির কাছেও এই অনুযোগ হতাশ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, *"সর্দার প্যাটেল ও নেহরু মনে করে যে, আমার পরিস্থিতি বুঝতে ভুল হয়েছে। ... দেশ ভাগ হলে নাকি শান্তি ফিরবে। ... কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা ভুল পথে এগোচ্ছি।"* প্যাটেল ও নেহরু কংগ্রেসের অধিবেশনে (জুন, ১৯৪৭) মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে যেভাবে সওয়াল করেছিলেন, তাতে এ ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়।

ভারত বিভাগ প্রসঙ্গে ইংরেজ সরকারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই বিশ্বাস করেন, ভারতকে নিজেদের অধীনে রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকার দীর্ঘদিন ধরে যে ভেদনীতি অনুসরণ করে আসছিল ভারত বিভাগ ছিল তারই অনিবার্য পরিণতি। আলিগড় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে *থিওডোর বেক, মরিসন* প্রমুখেরা হিন্দু-মুসলিম দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রচার দিয়ে এই প্রক্রিয়ার সূচনা। এই কাজে ইংরেজ দ্বারা স্যার সৈয়দ প্রভাবিত হয়েছিলেন, নাকি স্যার সৈয়দের চিন্তা-চেতনাকেই ইংরেজ অধ্যাপকগণ আলিগড় কলেজের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করেছিলেন — সে প্রশ্ন অবান্তর। প্রকৃত ঘটনা হল যে আলিগড় আন্দোলন বহু ক্ষেত্রেই তার মহান লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে সাম্প্রদায়িক চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছিল। বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর আন্দোলনের সময় ইংরেজের 'ভাগ কর ও শাসন কর' (Divide and Rule) নীতির নগ্ন প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। লর্ড কার্জন ঢাকা পরিভ্রমণ করে মুসলিম জনগণকে পৃথক রাজ্যের সুখস্বপ্ন দেখান। তিনি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিম-বাংলা থেকে পূর্ব-বাংলাকে পৃথক করার এবং সেই রাজ্যে মুসলমানদের সার্বিক স্বার্থরক্ষার সম্ভাবনা সফল করার কাজে মুসলমানদের সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানান। মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনে (১৯০৯) মুসলমানদের জন্য আলাদা প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯১৯-এর মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইনে সেই অধিকার ব্রিটিশ সরকার বহাল রাখে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২-এ 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' তত্ত্ব ঘোষণা করে সাম্প্রদায়িক বিভেদের আগুনে ঘি নিক্ষেপ করেন। এখানে হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান, শিখ ইত্যাদি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পাশাপাশি হিন্দুদের মধ্যে আন্তঃসম্প্রদায় বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। অনুন্নত হিন্দুদের 'পৃথক সম্প্রদায়' হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের সুদীর্ঘ ও পরিকল্পিত প্রয়াস ভারতীয় মানসে সাম্প্রদায়িক ভেদ চিন্তা এত গভীরে প্রোথিত করেছিল যে, তাকে উপড়ে ফেলা কোন ব্যক্তি বা দলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই শেষ মুহূর্তে ব্রিটিশ সরকার তার নিজের তৈরী ফ্রাঙ্কেনস্টাইন-এর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষকে ফেলে রেখে চলে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ স্বঘোষিত মহান ব্রিটিশ জাতি খুঁজে পায়নি।

সুচেতা মহাজনের ভাষায় : *"১৯৪৭-এর দেশ ভাগ মেনে নেওয়া ছিল সার্বভৌম মুসলমান রাষ্ট্রের জন্য লীগের আপসহীন দাবীকে ধাপে ধাপে কনসেশন দেওয়ার প্রক্রিয়ারই চূড়ান্ত পরিণাম।"*

ইংরেজ ভারত বিভাগ চাইছিল, তাই ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছে—এই সরল মূল্যায়ন মেনে নেওয়া কষ্টকর। কারণ বঙ্গভঙ্গ থেকে আইন অমান্য এই পর্বে ব্রিটিশ সরকার নিজেদের শাসন কায়েম রাখার প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টিতে মদত দিলেও; খণ্ডিত ভারত ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা সম্ভবত তাদেরও ছিল না। অনিতা ইন্দর সিং *'দি অরিজিনস্ অব পার্টিশন অব ইন্ডিয়া'* গ্রন্থে লিখেছেন যে, ব্রিটিশ সরকার খণ্ডিত ভারত চাননি। ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে তাঁদের সর্বাধিক প্রয়াস ছিল লীগ ও কংগ্রেসের যৌথ দায়িত্বে ভারত শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা। কারণ ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধ ভারতের অর্থ ও শক্তি ব্যবহার করার বাসনা তাদের ছিল। প্রধানমন্ত্রী এটলীও পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন যে, ব্রিটিশ সরকার ঐক্যবদ্ধ ভারত চেয়েছিল। সেজন্য প্রয়াস জারী ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতকে অখণ্ড রাখা সম্ভব হয়নি। ক্রীপস মিশন ও ক্যাবিনেট মিশনের বিভিন্ন প্রস্তাব এবং প্রচেষ্টা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক হবে না যে, ব্রিটিশ সরকার শেষ মুহূর্তে ভারত বিভাগ আটকাতেই বেশী আগ্রহী ছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইংরেজ নিজের তৈরী জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। সাম্প্রদায়িকতার বীজ তারা এতই বপন করেছিল যে, সেই বিষবৃক্ষের ফল ভোগ করা ছাড়া কোন বিকল্প তারা খুঁজে পায়নি। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ফিলিপস্ (C. H. Phillips) লিখেছেন, *"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তার চাপে ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ভারতের 'অখণ্ডতা' রেখে ক্ষমতা হস্তান্তরে মুসলিম লীগকে রাজী করতে না-পারায় ব্রিটিশ সরকারকে ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।"*

Scanned with CamScanner

শুধুমাত্র ইংরেজ চেয়েছিল বলেই ভারত বিখণ্ডিত হয়েছে, এ কথা ইতিহাসগত ভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে না। বিশেষ করে বিংশ শতকে ভারতের জাগ্রত জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপটে এই মূল্যায়ন কিছুটা একপেশে মনে হওয়া স্বাভাবিক। জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতো দুটি বিশাল গণসংগঠন এত বড় একটা পরিবর্তনে সম্পূর্ণ রূপে নিষ্ক্রিয় ছিল কিংবা অসহায়ের মতো সব কিছু মেনে নিয়েছিল, এ কথা মানা যায় না। বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও লেখক অন্নদাশংকর রায় বলেছেন, "ইংরেজ ভাগ করে দিয়ে গেল এটা পূর্ণ সত্য নয়। কংগ্রেস ভাগ করিয়ে নিল, এটাও অনেকটা সত্য। ... আমরা যেন জিন্নাকেই পুরোপুরি দায়ী না করি, ইংরেজকেও না।" অর্থাৎ ভারত বিভাগের প্রক্রিয়ায় জিন্না ও মুসলিম লীগ এবং জাতীয় কংগ্রেস কোনও না কোনও ভাবে জড়িত ছিল।

প্রশ্ন হল কংগ্রেস কি চেষ্টা করলে এই বিভাজন বন্ধ করতে পারত? কিংবা এই বিভাজনে কংগ্রেসের ভূমিকা কি? এই উত্তরে বলা যায় যে, ভারতের বৃহত্তম গণসংগঠন জাতীয় আন্দোলনের পথিকৃৎ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কোনভাবেই এই মর্মান্তিক পরিণতির দায়িত্ব এড়াতে পারে না। সুচেতা মহাজন লিখেছেন, "কংগ্রেস দীর্ঘকাল ধরে মুসলমান জনতাকে জাতীয় আন্দোলনে টেনে আনতে পারেনি, মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার উত্তাল তরঙ্গকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি।" ড. অমলেশ ত্রিপাঠীও এই কারণে কংগ্রেসকে দায়ী করেছেন। আলিগড় পন্থী প্রচারিত কংগ্রেসের 'হিন্দু' প্রতিষ্ঠানিক চরিত্র খণ্ডনের পরিকল্পিত প্রয়াস কংগ্রেসের ছিল না। নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ বিশ্বাস করতেন যে, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার মুসলমানরা প্রয়োগ করবেন না। সুচেতা মহাজন লিখেছেন, "একটি অবাস্তব আশাও কংগ্রেসের মনে ছিল—ব্রিটিশরা চলে গেলে বিরোধ মিটিয়ে ফেলা যাবে এবং হিন্দু-মুসলমান উভয়ে মিলে স্বাধীন ভারত গড়ে তুলবে।" স্বয়ং নেহরু কারিয়াপ্পাকে ১৯৪৭-এ লিখেছিলেন, "একটা ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—শেষ পর্যন্ত এক ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত গড়ে উঠবে।" কংগ্রেস নেতৃত্বের এই আত্মবিশ্বাস দেশকে কাদের পাশে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ড. সুমিত সরকার-সহ কেউ কেউ বলেন যে ভারত ছাড়ো (১৯৪২) আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় পর কংগ্রেস আর বৈপ্লবিক সংগঠন ছিল না। ১৯৪৫-এ মুক্তি লাভের পর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই ১৯৪৫-৪৭ এর মধ্যবর্তীকালে লীগ বা ব্রিটিশ সরকারের সাথে মতভেদ হলেও কংগ্রেস কোন রকম আন্দোলনের ডাক দেয়নি। মার্কসবাদীদের অভিযোগ হল ১৯৪৫-৪৬-এর বিভিন্ন গণ অভ্যুত্থানকে এক সূত্রে গ্রথিত করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত করতে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছিল। তবে এই কারণে কংগ্রেসকে মার্কসবাদীদের সমালোচনার প্রতিবাদ করেছেন ড. ত্রিপাঠী। কমিউনিস্টরা যা করেনি, সেজন্য অন্য সংগঠনকে অভিযুক্ত করার নৈতিক অধিকার তাদেরও নেই বলে ড. ত্রিপাঠী মনে করেন।

বস্তুত ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কংগ্রেসের কাছে মানুষের প্রত্যাশা ছিল অনেক। কংগ্রেসের আন্দোলনে সার্বিক জনসংযোগের অভাব এবং নানা পর্যায়ে দোদুল্যমানতা পরিস্থিতিকে ঘোরালো হতে সাহায্য করেছিল, এ বিষয়েও সন্দেহ নেই। তবুও একথা সত্য যে, পরিস্থিতির অনিবার্য পরিণতি ছিল এই দুঃখজনক ঘটনা। সুচেতা মহাজন লিখেছেন যে, জিন্নার আপসহীন মনোভাব কিংবা কংগ্রেস নেতৃত্বের ক্ষমতা লিপ্সা নয়; জনগণের সাম্প্রদায়িক চেতনাই দেশ বিভাগ অনিবার্য করেছিল। সাম্প্রদায়িকতার শক্তিকে কংগ্রেস প্রাথমিকভাবে চিনতে ব্যর্থ হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে তার ক্রুর প্রকাশ গান্ধীজির মতো জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্বকেও অসহায় ভাবে এই ভাঙনের নীরব সাক্ষী হতে বাধ্য করেছিল। দেশ বিভাগ শেষ মুহূর্তে ছিল অনিবার্য; কিন্তু জন্ম মুহূর্তে বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনার বিনাশ ঘটালে হয়তো এই সর্বনাশ এড়ানো যেত।

Scanned with CamScanner